বিপিনগঞ্জ বাজার

ইমরান রাইহান

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক

অনলাইন পরিবেশক
ওয়াফিলাইফ ডট কম

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না
পৃষ্ঠাসজ্জা: শাহরিয়ার হাসান
বানান সমন্বয়: মনিরুজ্জামান রোবেন

বিক্রয়কেন্দ্র:

দোকান নং : ১৮, কওমি মার্কেট (১ম তলা),
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৬ ০১ ৭০৩ ৭০৫

মূল্য: ৪০০ টাকা (চারশত টাকা মাত্র)

সঞ্চালন
প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা

অর্পণ

তানভীর আহমাদ,
অনেক সফরের সফরসঙ্গি

সূচিপত্র

লেখকের কথা ৯

সাদেকপুরের বৃদ্ধ ইমাম ১১

স্মৃতিপথের আল মাড়িয়ে ১৭

মাস্টার নানা.....২১

জয়নাল মাওলানা.....২৪

শল্লার খেজুর বাগান.....২৬

লাউড়ের গড়ে উদাস সন্ধ্যা.....২৮

রাজাপুরের স্মৃতি.....২৯

কাকাবোর খানকা.....৩১

আহমাদুল্লাহ মাওলানা.....৩৩

আমাদের গ্রামের বৃদ্ধরা.....৩৬

হাজি সাহেব দাদা ৪০

বিপিনগঞ্জ বাজার ৪৮

চর মজলিসপুর.....৫২

কাচারি ঘর ৫৪

শামীম.....৫৭

নেত্রকোণা.....৬২

সুবর্ণগ্রামের পথ ধরে ৬৭

দরসবাড়ি মাদরাসায় নেমে আসা সোনালি রোদ ৮৪

মহামারির দিনগুলোতে জিন.....৮৮

পল্টন ময়দান ৯৬
আমার উস্তাদ আমার শিক্ষক.....৯৮
প্রজন্মের দূরত্ব ১০২
১৩৬ নং বাসা ১০৪
পত্রাবলি ১০৮
টেপরেকর্ডার ১১৫
সাইমুম সিরিজ ১১৯
কিশোরকণ্ঠ ১২১
নাগেরগাতি ১২৩
কাঁটাবন মোড় ১২৮
আমাদের ঘোরাঘুরি ১৩০
কল্পনার কাঁকনপুর ১৩৪
আড়ালের কণ্ঠ.....১৩৬
বৃষ্টি ১৪০
দারুর রাশাদ ১৪৩
স্মৃতির আর্কাইভ ১৫৪
শরিয়তুল্লাহ মৌলভী ১৫৯
কাজী ভাই.....১৬২
দিনলিপি.....১৬৬
শবে বরাত ১৭৮
ইসহাক উবায়দি ১৮১
মুরিদপুরের পীর.....১৮৪
লেংগুরা বাজার ১৮৯

লেখকের কথা

বিপিনগঞ্জ বাজার বইটিকে কোন ধারায় ফেলবো তা নিয়ে আমার নিজের দ্বিধা আছে। এখানে বেশিরভাগ লেখা স্মৃতিধর্মী, ছোপ ছোপ জমাট বাঁধা স্মৃতির উপর আলো ফেলার সামান্য চেষ্টা করেছি, ফলে হারিয়েছে বিবরণের ধারাবাহিকতা। কিছু লেখায় আছে ভ্রমণের বিবরণ, কিন্তু ভ্রমণ তো স্মৃতির বাইরে কিছু নয়, ফলে সেখানেও সবকিছু ছাপিয়ে স্মৃতিই হয়ে উঠেছে মূখ্য।

যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করেন, বিপিনগঞ্জ বাজার পড়ে পাঠক কী শিখতে পারবেন? তাহলে এর কোনো সদুত্তর নেই আমার কাছে। বইটি লিখে আমি নিজে আনন্দ পেয়েছি, অতীত জীবনের দিনগুলোর সাথে কিছু সময় কাটাতে পেরেছি এতেই আমার তৃপ্তি। আমার মনে হয়েছে গত দুই দশকে অনেক জিনিস চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে। তাই নিজের স্মৃতি থেকে সেসব বিষয় তুলে ধরার টুকটাক চেষ্টা করলাম, আমি চাই কিছু লিখিত উপাদান থাকুক, যেন পরে কেউ চাইলে সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটা ধরতে পারেন।

স্মৃতির সাথে ব্যক্তিগত কিছু চিন্তাভাবনাও উঠে এসেছে নানা জায়গায়, যারা দ্বিমত করবেন সবাইকে জানাই স্বাগতম।

ইমরান রাইহান
মিরপুর, ঢাকা

সাদেকপুরের বৃদ্ধ ইমাম

দিলদার মার্কেট পৌঁছতে রাত বারোটা বেজে গেল। শীতের রাত, চারদিকে কুয়াশা, ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলো সে কুয়াশা ভেদ করে বেশিদূর ছড়াতে পারছে না। দোকানের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে কয়েকটা কুকুর। চারপাশে অদ্ভুত নির্জনতা। ছমির মুন্সি থেকে আসার সময় দেখেছি ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাম। মাশুক ভাই দাঁড়িয়ে আছেন বাজারের শেষ মাথায়, দেখা হতেই চিরচেনা হাসি ফুটে উঠল চেহারায়।

'আরে মিয়া এত দেরি, কইলাম না একখানে যামু।' বলতে বলতে হাত মেলালেন নোমানের সাথে।

'কই যাইবেন?' কাঁপতে কাঁপতে বললাম। বেশ শীত করছে, দুহাত ইতোমধ্যে চলে গেছে জ্যাকেটের পকেটে।

'সাদেকপুর যামু। পরিচিত এক ইমাম সাবের মসজিদে মাহফিল। আমারে যাইতে কইছিল আগে, আপনেরা আইবেন এইজন্য আর যাই নাই। মাহফিল মনে হয় শেষ এখন; তাও যাই, দেখা করে আসি, বেচারা অনেকবার কইছে।'

'চলেন, চলেন। আইছি তো ঘুরার লাইগাই। বাড়িত যাই কী কাম?' ইতোমধ্যে নোমানও আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এই শীতের রাতে গ্রামে হাঁটার সুযোগ পেলে কে হারাতে চায়?

দিলদার থেকে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরলাম আমরা। সাদেকপুর নামটায় কেমন যেন মাদকতা জড়িয়ে আছে। ছোটবেলা থেকে অনেক শুনেছি এই গ্রামের নাম, স্থানীয়রা অবশ্য সাদেক্কুর বলে, কিন্তু কখনো যাওয়া হয়নি এখানে। আমাদের চলার শব্দে ভেঙ্গে যাচ্ছে রাতের নৈঃশব্দ্য, টিনের চালে শিশির ঝরার শব্দও

শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। বামে একটা বাঁশের ঝোপ পাশ কাটাই, বাতাসে শন শন শব্দে কাঁপছে বাঁশপাতা। নোমানের কাঁধে গুঁতো দিয়ে বললাম, বাঁশ গাছে কে থাকে?

'চুপ চুপ, এগুলা বলিস না।' শিউরে উঠল সে।

কোথাও গাছের নিচে ছোপ ছোপ অন্ধকার বাসা বেঁধেছে, কোথাও হালকা আলো, এর মধ্যে পথ চলছি তিনজন। গৃহস্থবাড়ির হাসনাহেনার সুবাস লাগছে নাকে, মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির সামনেও হাসনাহেনা গাছ ছিল। রাতে বেশ সুবাস দিত, কিন্তু আমরা কখনোই গাছতলায় যেতে সাহস করিনি। মিলন ভাই একবার বলেছিলেন রাতে ফুলের গন্ধে জিন আসে, ওদিকে যেও না কখনো। সত্য বলেছেন কী মিথ্যা তা আর যাচাই করার উপায় নেই! দুবছর আগে দেখেছি খালপাড়ে নতুন এক কবর। মিলন ভাই শুয়ে আছেন সেখানে, মাথার কাছে সযত্নে একটা হাসনাহেনার ডাল পুঁতে দিয়েছে কেউ।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মাইকের শব্দ, সুরেলা কণ্ঠে মুনাজাত ধরেছেন কেউ। নোমানের কী মনে হয় জানি না! কিন্তু শীতের গ্রামে যখনই ওয়াজের শব্দ শুনি, মনে হয় আমার বুকে বইছে হাহাকার ও অপ্রাপ্তির বেদনা। গ্রামে ওয়াজের শব্দ শহরের মত কর্কশ নয়, দালানকোঠা আর স্থাপনায় শব্দ প্রতিধ্বনিত হওয়ার ভয় নেই, গাছের মগডালে বেঁধে রাখা মাইক অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয় শব্দ, সবটুকু কোমলতা ধরে রেখেই।

'ওয়াজ তো শেষ হই গেল' ছোট একটা মেঠোপথ ধরে হাঁটছি এখন, দুপাশে বুনো ফুলের ঝোপ। ছোটবেলায় দেখেছি এসব ঝোপে ভাঁটফুল দেখেছি অনেক, কিন্তু ভাঁটফুল এখন প্রায় বিলুপ্ত, চোখেই পড়ে না সহজে।

'হ, শেষ হইবই তো। অনেক রাইত হইছে না। ওয়াজের লাইগা তো আসি নাই। আসছি আপনেরে মসজিদটা দেখামু আর ইমাম সাবরে দেখামু' ভরাট কণ্ঠে বললেন মাশুক ভাই।

'নতুন মসজিদ নাকি?'

'হ, কয়দিন আগে কাজ শেষ হইল, আইজকা উদ্বোধন উপলক্ষেই মাহফিল।'

মুনাজাত শেষ হয়েছে। মাইকে কেউ বলছে—সবার জন্য বিরিয়ানির ব্যবস্থা আছে, নিয়ে যাবেন। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি মসজিদের দরজায় মৃদু হৈ-হুল্লোড়, প্যাকেট নিয়ে ধাক্কাধাক্কি, একটু রাগ-অভিমান, হাসি। যতই সামনে এগুচ্ছি মানুষের কোলাহল কানে আসছে, বুঝতে পারছি মসজিদের কাছাকাছি চলে এসেছি। মসজিদের সামনে এসে দেখি বাড়ি ফিরছে শ্রোতারা। একপাশে রাখা গাড়ির সামনে বেশ ভিড়, সম্ভবত প্রধান বক্তা গাড়িতে উঠছেন, চারদিক থেকে গাড়ি ঘিরে রেখেছে লোকজন। একজন বৃদ্ধ ছুটে এলেন দ্রুত, সম্ভবত বক্তার সাথে মুসাফা করতে চান তিনি, কিন্তু তাঁর আগেই ছেড়ে দিয়েছে গাড়ি, একটু হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ।

লোকজনের কোলাহল কিছুটা কমে এলো সামনে এগুলাম আমরা। ছোটখাটো বয়স্ক একজন মানুষ এসে স্বাগত জানালেন আমাদের।

'এত দেরি কেন? কত মানুষ আসছিল। কইছিলাম আগে আইতে' কিছুটা অভিমানের সুরে মাশুক ভাইকে বললেন তিনি।

'আইতাম আগেই, আমার মেহমান আইছে, তাই হেগোরেও নিয়া আইলাম' হেসে আমাদের সাথে হাত মেলালেন বয়স্ক মানুষটি। আরো কিছু বলতে যাবেন, তখন পেছন থেকে কে যেন ডেকে নিলেন, মাহফিল শেষ হলে নানা ব্যস্ততা থাকে, বুঝলাম তিনি ফিরতে সময় লাগবে।

'আচ্ছা! উনার ব্যাপারে বলেন কিছু'

'হে এক আজব জিনিস। এই গ্রামে আছে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধইরা, আমগো ছোটবেলা থেকেই হেরে এইখানে দেখি। বাড়ি খুলনার ওইদিকে, চৌমুহনী আলিয়ায় আসছিলেন পড়তে। এলাকার ছোট মসজিদে ইমাম দরকার, সবাই তাই বড় হুজুর নুরুল হুদা সাবরে কইছে, পরে উনি এই হুজুররে পাডাইছেন। সেই থেকে উনি এইখানেই। বছরে এক দুইবার বাড়ি যায়, বাকি সময় এইখানেই থাকে। বিয়েশাদি করে নাই, এ নিয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও রাগ করে। অল্প বেতন পায় সেইটা নিয়াই কোনোমতে থাকে। একটু বোহেমিয়ান ভাব আছে হের মইধ্যে। হে আর আমি মিলা রাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরি হাঁটি। হের জীবনে তেমন কোনও চাওয়া নাই। খালি একটাই স্বপ্ন আছিল মসজিদটা বড় কইরবো। নানা জনরে উস্কাইছে মসজিদের কাজ ধরতে, কেউ সাড়া দেয়

নাই, পরে নিজেই কাজ শুরু করছে। মানুষের কাছে কালেকশন করি করি দুই-আড়াই বছরে এই মসজিদ বানাইলো। মসজিদের সব ডিজাইন করছে হে নিজের মত, যেইখানে যা ভাল্লাগছে সব একত্র করে দিছে। এলাকার লোক দেইখলো ভালই তো কাজ আগাইতেছে, এবার হেরাও হের লগে যোগ দিছে।'

ইমাম সাহেব কাজ সেরে ফিরে আসছেন, তাকে দেখে কথা থামালেন মাশুক ভাই।

'মিয়া মেহমান লই আইছেন দেরিতে, আগে আইলে হুজুরগো লগে দেখা করাইতাম, আইচ্চা চলেন মসজিদ দেখাই মেহমানগোরে' মাশুক ভাইয়ের হাত ধরে মসজিদের দিকে চললেন ইমাম সাহেব। পিছু নিলাম আমরা।

মসজিদের সামনে এসে চমকে গেলাম। চমৎকার ফুলের বাগান করা হয়েছে সামনে। আবছা আলোয় সবগুলো ফুল চেনা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে কোনো রুচিশীল মানুষের হাত আছে এখানে। এক তলা মসজিদ। দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করি আমরা। চমৎকার টাইলস।

'অনেক খুইজা খুইজা এই টাইলস চয়েস করছি আমি' আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন ইমাম সাহেব। তাঁর চেহারায় তৃপ্তির ছাপ।

মসজিদের ভেতরে নজর বুলালাম, দরজা ও মিম্বারের ডিজাইন বেশ আকর্ষণীয়, সচরাচর এমন ডিজাইন চোখে পড়ে না। বুঝাই যাচ্ছে কাজটি যিনি করেছেন তিনি সময় নিয়েই করেছেন। অবশ্য মসজিদের দেয়াল ও পিলারে ডিজাইনের আতিশয্য আছে। মাশুক ভাইকে সে কথা বলতেই মুচকি হাসলেন।

'ঠিক বলছেন, হেরে অনেকবার বুঝাইছি, কিন্তু হের আবেগ অন্যরকম। যেখানে যা পায়, করে ফেলে।'

মাশুক ভাইয়ের কথাটা শুনে ফেললেন ইমাম সাহেব। আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন একটা পিলারের সামনে।

'যেখানের যেই ডিজাইন ভাল্লাগছে, সেইটা এখানে আনছি আমি। এই যে পিলারের নিচের অংশ, এইটার ডিজাইন সুলতান আহমদ মসজিদের অনুকরণে, উপরের অংশ আয়া সোফিয়ার একটা পিলারের স্টাইলে, এর উপরের অংশ

মসজিদুল হারামের একটা ডিজাইন, হজের সময় দেখে ভাল্লাগছিল' বলতে বলতে ইমাম সাহেবের চোখমুখ চক চক করে উঠল।

'ওই যে দেয়ালের চারপাশে কাজ দেখছেন, ওইটা তুর্কির একটা মসজিদের, নাম মনে নাই, ভিডিওতে দেখছিলাম। আর ওই যে জানালার উপর ফুলের ডিজাইন, এটা এমদাদিয়া থেকে ছাপা কুরআন শরিফের উপরে আছে।' বলতে বলতে হাত ধরে নিয়ে এলেন বারান্দায়। এক কোণে বিছানা পাতা; সামনে ছোট একটা টুল, উপরে কয়েকটা বই।

'এইখানে থাকি আমি' আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে লাজুক ভঙ্গিতে বললেন ইমাম সাহেব।

'হুজুর মসজিদেই থাকে। সবাই উনাকে নিজের ঘরে রাখতে চায়, উনি থাকে না। তবে মসজিদের কাজ তো শেষ হইলো, এবার মনে হয় সবাই মিলে ঘর তুলে দিবে একটা হুজুরের জন্য।' মাশুক ভাই বললেন।

দ্রুত হাত নাড়লেন ইমাম সাহেব, বুঝিয়ে দিলেন—এই আলোচনা পছন্দ নয়। দরজার দিকে ইশারা করে বললেন— 'এই দরজার জন্য অনেক খরচ হয়েছে। ভালো কাঠের জন্য কত জায়গায় যে ঘুরেছি। পরে খবর পেলাম খাগড়াছড়ির বাজারে ভালো কাঠ পাওয়া যায়। আমি আর মাশুক গেলাম, ওইখানেই কারিগররে ডিজাইন দিলাম, দরজা বানায়া নিয়া আসলাম। কত জায়গায় যে গেছি, একবার শুনলাম পঞ্চগড়ের ওদিকে ভালো পাথর পাওয়া যায়, ব্যস! চইলা গেছি ওদিকে।'

'কষ্ট কম হয় নাই। এই যে সামনে বাগান, কত জায়গা থেকে এর জন্য ফুল আনছি। একবার গেলাম রাঙ্গামাটি, কী একটা পাহাড়ি ফুল দেখলাম, ভালো লাগল নিয়ে আইলাম। পরে অবশ্য বাঁচে নাই। দাগনভূঁইয়া আর ফেনীর সব নার্সারি ঘুরা শেষ আমার। নতুন কোনো ফুল পাইলেই নিয়া আসছি। দেখেন এখন কী সুন্দর লাগতেছে না? একটা কাজ বাকি আছে এখনো, বাগানে এক দুইটা আলোর ব্যবস্থা করবো, রঙিন আলো। মুসল্লিরা আসবে, বাগান দেইখাই শান্তি। কী কন মাশুক মিয়া?' আগ্রহী কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ইমাম সাহেব।

'হুজুর খাইতে চলেন, অনেক রাইত হইছে' বাহির থেকে উচ্চ গলায় বললেন কেউ।